ATHENA, VOLUME VI, JULY 2022 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 112-122
www.athenajournalcbm.in

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিল্প ও তার পরিণতি অন্বেষণে রমেশচন্দ্র দত্তের চিন্তা-চেতনা

বলরাম দাস*

প্রাপ্ত: ২০/০১/২০২২ পরিমার্জন: ২০/০৩/২০২২ গৃহীত: ১৯/০৪/২০২২

সারসংক্ষেপ: *রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। তবে তিনি নিজে একজন ভিন্ন পরিচয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বাঙালী আই.সি.এস. অফিসার। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বন্ধুদ্বয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বিলেতে (ইংল্যান্ডে) পাড়ি দিয়েছিলেন আই.সি.এস. (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। তিন বছর পর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনজনই স্বমহিমায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ঐ বছরই (১৮৭১) আলিপুরে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর' পদে নিযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর সরকারি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। সরকারি কর্মজীবনে থাকাকালীন তিনি বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্পের বাস্তবরূপ তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পের যে পরিবেশ একদা ছিল তা ক্রমশ নষ্ট হতে শুরু করেছে। এখন প্রশ্ন হল – ভারতবর্ষের শিল্পের এই ক্রম অবনতির পিছনে মূল কারণ কী ছিল? এর পিছনে কী ব্রিটিশ সরকার দায়ি ছিল? যদি দায়ি হয়ে থাকে, তাহলে একজন সরকারি কর্মচারি হওয়ায় রমেশচন্দ্রের পক্ষে কী সরকারের সমালোচনা করা সম্ভব ছিল? ভারতবর্ষের শিল্প অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা কী ছিল? এই সকল প্রশ্নের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *কৃষি, শিল্প, রেলপথ, পুঁজিপতি, ব্যক্তিগত বাণিজ্য, সেচ-ব্যবস্থা, হোমচার্জ, দুর্ভিক্ষ, হাউস অব কমন্স।*

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়।
e-mail: das.balaram1984@gmail.com

সরকারি কর্মজীবনে থাকাকালীন (১৮৭১-৯৭) ও অবসর গ্রহণের পর রমেশচন্দ্র দত্ত বিভিন্ন সময়ে স্বদেশ ও বিলেত ভ্রমণ করেছিলেন। বিলেতের বিভিন্ন দেশে তিনি বিচরণ করেছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির সঙ্গে ইউরোপের কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর *England and India: A Record of Progress during a Hundred Years 1785-1885* (১৮৯৭), *The Economic History of India. Vol. I: Under Early British Rule 1757-1837* (১৯০২) প্রভৃতি গ্রন্থে এবং 'Famines in India' (১৮৯৭), 'The Economic Condition of India' (১৯০১) 'Indian Manufacture' (১৯০১) বিলেতে দেওয়া প্রভৃতি ইংরেজি বক্তৃতায় এবং 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি' (*ভারতী,* শ্রাবণ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ), 'ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা' (*ভারতী,* ফাল্গুন ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি বাংলা প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষের শিল্পের অতীত ও বর্তমান অবস্থান ও তার দুরবস্থার কারণ তুলে ধরেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক প্রশাসকের বিরূপ শিল্পনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে রমেশচন্দ্রকে প্রায়শই দেখা গিয়েছিল। স্বভাবতই তিনি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে যান। এবং এর পরিণাম স্বরূপ সরকারকেও তাঁর পদোন্নতি রদ করতে দেখা যায়। ফলে অবসরের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করে (১৮৯৭) সরাসরি ভাবে নিজের রচনায় ও স্বদেশে-বিদেশে দেওয়া একাধিক বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক সরকারের কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির সমালোচনা করতে শুরু করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র বলেন যে, ইংল্যান্ড যে সময় শিল্প বিপ্লবের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল, একইসময় ভারতবর্ষের শিল্পের পরিবেশ ক্রমশ অধোগতিতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। তাই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিল্প সম্পর্কে রমেশচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও কি শিল্প বিপ্লবের পরিবেশ জন্ম নিতে পারত না? উত্তরে রমেশচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও শিল্প বিপ্লবের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে হল না, হল ইংল্যান্ডে।

রমেশচন্দ্র বলেন যে, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের যে পরিবেশ ছিল, ঐ একই সময়ে ভারতবর্ষেও সেই অনুকূল পরিবেশ ছিল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটেনে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত, ভারতবর্ষের মতই তা ছিল অত্যন্ত সরল।[১] কিন্তু ব্রিটেনের শ্রেণী বিভাজন, প্রলেটারিয়ান, বুর্জোয়া অবস্থান এবং পুঁজিপতিদের আর্থিক সহযোগিতা প্রভৃতি শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে পরিমাণ পুঁজি সঞ্চিত ছিল, শিল্পের বিকাশের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশি পুঁজির প্রয়োজন ছিল। আর এই ঘাটতি পূরণের জন্য তাঁরা বেছে নিয়েছিল উপমহাদেশ ভারতবর্ষকে।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ পুনর্নবীকরণ ও রমেশচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া

রমেশচন্দ্র বলেন যে, ক্রমে উপমহাদেশ ভারতবর্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া ক্ষমতার অধিপতি হয়ে উঠেছিল। তাঁরা ভারতবর্ষের সম্পদ কুক্ষিগত করে চলেছিল। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা বেশি দিন স্থায়ী হল না। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ পুনর্নবীকরণের সময় তাঁদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটানো হয়েছিল। সেই স্থানে স্বীকৃতি পেল ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার।

রমেশচন্দ্র বলেছিলেন যে, এই ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে শিল্প বিকাশের ব্যাপারটাই চূর্ণ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসন। ফলে শিল্প ও কৃষি বিপ্লব হাতে হাত মিলিয়ে এগোতে পারল না। এমনকি এদেশে যে বিপুল প্রাথমিক সঞ্চয় জন্ম নিয়েছিল, গড়ে উঠেছিল ঋণ-সঞ্চালন ব্যবস্থা—তাতেও ভরাডুবি হয়েছিল ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থলোলুপতায়। এদেশে শিল্প বিপ্লবকে কার্যকরী করার জন্য ইতিপূর্বে সৃষ্ট মূলধনও জাহাজবন্দী হয়ে চলে গিয়েছিল ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে। রমেশচন্দ্র দেশীয় শিল্পের এই পরাভবকে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের বিষাদময় ঘটনা বলে বর্ণনা করেছিলেন। ঔপনিবেশিক সরকারের এই প্রকার নীতির ফলে ভারতবর্ষের সম্পদের উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল।[২]

বিপান চন্দ্র বলেন যে, রমেশচন্দ্রের ন্যায় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বুঝেছিলেন কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে ভারসাম্য

ভারতবর্ষে ছিল ইংরেজ নীতি তার ধ্বংস ঘটিয়ে ভারতীয়দের কৃষি নির্ভর করে তুলেছিল।[৩] রমেশচন্দ্র বলেছিলেন যে, জীবিকার্জনের জন্য পৃথিবীর সকল জাতিই দুটি উপায়ের উপর নির্ভরশীল – কৃষি ও শিল্প। যদি কোনো জাতি এই দুটি উপায়ের মধ্যে একটিতে বঞ্চিত হয়, তা তার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যে জাতির শিল্প নেই, শুধু কৃষি অবলম্বন, তাঁদের অর্ধেক উপায় বন্ধ। জীবনধারণের একমাত্র উপায় কৃষি হলে যে বছর ভালো শস্য উৎপাদন হবে না সে বছর উপবাস তো ঘটার কথা। 'আমাদের সেই অবস্থাই হইয়াছে, বিগত চল্লিশ বৎসরে দশবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, এবং দেড় কোটি মনুষ্য অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।'[৪]

ইংল্যান্ডের সংকীর্ণ শাসননীতি ও শিল্পহানি

রমেশচন্দ্রের মতে, ইংল্যান্ডের সংকীর্ণ শাসননীতিই আমাদের শিল্পহানির কারণ। বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ রেশম ও তুলা বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভারতবর্ষের শিল্পজাত দ্রব্য এশিয়া ও ইউরোপের নগরে বিক্রয় করা হত। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনভার ব্রিটিশদের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় তাঁরা ভারতীয় শিল্পের অবনতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ১৭ই মার্চ, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তাঁদের কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছিলেন যে,

> বঙ্গের রেশম প্রস্তুতের ব্যবসাকে উৎসাহিত এবং রেশম বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করা হউক...যাহারা রেশম কাটে, তাহাদের সকলকে কোম্পানির কলকারখানায় কার্য করিতে বাধ্য করা হউক। যদি কেহ এ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র এ কার্য করে তবে সে কঠিন দণ্ড পাইবে।[৫]

রমেশচন্দ্র বলেন, 'হাউস অব কমন্স'-এর (House of Commons) নির্বাচিত সভ্যগণও স্বীকার করেছিলেন যে, এই আদেশের ফলে ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের শিল্প-কারখানার কাঁচামালের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের বাষ্পচালিত বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের শ্রম-চালিত শিল্পের অবলুপ্তি ঘটেছিল।[৬] ১৭৯৪-১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কি পরিমাণ মূল্যের বস্ত্র ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল তার একটা তালিকা রমেশচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন।

সারণি: ১. (ক). ১৭৯৪-১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে বস্ত্র প্রেরণের মূল্যের হিসাব[৭]

সাল	টাকার পরিমাণ		সাল	টাকার পরিমাণ
১৭৯৪	১৫৬০ টাকা		১৮০৪	৫৯৩৬০ টাকা
১৭৯৫	৭১৭০ টাকা		১৮০৫	৩১৯৪৩০ টাকা
১৭৯৬	১১২০ টাকা		১৮০৬	৪৮৫২৫০ টাকা
১৭৯৭	২৫০১০ টাকা		১৮০৭	৪৬৫৪৯০ টাকা
১৭৯৮	৪৪৩৬০ টাকা		১৮০৮	৬৯৮৪১০ টাকা
১৭৯৯	৭৩১৭০ টাকা		১৮০৯	১১৮৪০৮০ টাকা
১৮০০	১৯৫৭৫০ টাকা		১৮১০	৭৪৬৯৫০ টাকা
১৮০১	২১২০০০ টাকা		১৮১১	১১৪৬৪৯০ টাকা
১৮০২	১৬১৯১০ টাকা		১৮১২	১০৭৩০৬০ টাকা
১৮০৩	২৭৮৭৬০ টাকা		১৮১৩	১০৮৮২৪০ টাকা

ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের শিল্প বিস্তারের অনুৎসাহ দেখলে অবাক হতে হয় বলে রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন। রমেশচন্দ্র বলেন যে, ভারতবাসীর কিসে উন্নতি হবে, পুরাতন লুপ্তপ্রায় শিল্পাদি কিসে পুনরুজ্জীবিত হবে, কি ভাবে দুর্ভিক্ষ দমন ও প্রজাদের প্রাণ রক্ষা হবে – এগুলি 'হাউস অব কমন্স' (১৮১৩) সভায় আলোচিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। প্রায় প্রত্যেক সাক্ষীকেই (ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার টমাস মুনরো) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কি হলে, কোন উপায় অবলম্বন করলে ভারতবাসী নিজ দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে বিলেতি শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করবে। রমেশচন্দ্রের

পক্ষে এই গোপন সাক্ষ্য লেখা বা প্রকাশিত করা সহজ ছিল না। তিনি বলেছিলেন,

> এ ব্যাপারটা যদি আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি বিষয় না হইত, তাহা হইলে এই সাক্ষ্যের অনেকগুলি প্রশ্নোত্তর পাঠ বিশেষ আমাদের কারণ হইতে পারিত।[৮] (রমেশচন্দ্রের নিজস্ব অনুবাদ)

এসত্ত্বেও রমেশচন্দ্র বেশ কয়েকজন সাক্ষীর মন্তব্য তুলে ধরেছিলেন। রমেশচন্দ্র বলেছিলেন যে, 'হাউস অব কমন্স'-এর সভাতে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ''তুমি ত ভারতবাসীর চরিত্র ও অভ্যাসের বিষয় ভালরূপ অবগত আছ, তোমার কি মনে হয়, ভারতবাসী নিজের ব্যবহারের জন্য বিলাতী মাল খরিদ করবে?'' ওয়ারেন হেস্টিংস উত্তরে বলেছিলেন,

> প্রয়োজন সাধন কিংবা বিলাস চর্চার জন্যই লোকে পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করে। ভারতে দরিদ্র লোকের বলিতে কোনই প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান, খাদ্য আর যৎসামান্য বস্ত্র, এই সমস্ত দ্রব্যই তাহাদের পদতলে মৃত্তিকা হইতেই প্রাপ্তব্য।[৯] (রমেশচন্দ্রের নিজস্ব অনুবাদ)

স্যার জন ম্যাকলম ভারতবাসীর সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেরূপ অভিজ্ঞতা তখনো পর্যন্ত অতি অল্প ইংরেজই লাভ করেছিলেন বলে রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন। সাক্ষ্যতে ম্যাকলম সাহেব বলেছিলেন,

> বিলাতি দ্রব্যের ক্রেতা হওয়া তাদের (ভারতবাসী) পক্ষে সম্ভব নহে। একেতো তাহাদের জীবন প্রণালী অতি সাদাসিধে। যদি'বা তাহাদের এসব দ্রব্য প্রয়োজনও হইত তাহা হইলেও কিনিতে পারিত না, কারণ সে সামর্থ্য তাহাদের নাই।[১০] (রমেশচন্দ্রের নিজস্ব অনুবাদ)

সমস্ত সাক্ষ্যের মধ্যে স্যার টমাস মুনরোর সাক্ষ্যই সর্বাপ্রেক্ষা প্রণিধানযোগ্য বলে রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতো ভারতহিতৈষী, সহানুভূতি সম্পন্ন, ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে যত্নশীল আর কারোর মধ্যে দেখা যায়নি বলে রমেশচন্দ্র মনে করেছিলেন। মুনরো সাহেব বলেছিলেন,

> আমার মনে হয়, ভারতে বিলাতি দ্রব্যের বিক্রয় সম্বন্ধে মূল্যাধিক্য ছাড়াও কতিপয় বিঘ্নজনক কারণ বর্তমান আছে। এই কারণগুলির মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব, ধর্মগত ও জাতিগত অভ্যাস বিভিন্নতা এবং সর্বোপরি তাহাদের নিজ শিল্পের নৈপুণ্য প্রধান।[১১] (রমেশচন্দ্রের নিজস্ব অনুবাদ)

কিন্তু বণিকরাজ উৎসাহ না হারিয়ে বিলেতি মাল ভারতবর্ষে প্রেরণ ও প্রচলন করতে যথাসাধ্য যত্ন নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রেরণের উপর যৎসামান্য শুল্ক নির্ধারিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র বলেছিলেন যে, এই নীতির পরিণাম সম্পর্কে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির একজন ডিরেক্টর হেনরি সেন্ট জর্জ বলেছিলেন,

> তুলার বস্ত্র কতদিন ভারতের প্রধান শিল্প বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহার উপর আমরা শতকরা ৬৭ টাকা শুল্ক বসাইয়া এদেশে যে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছি তাহা নহে, উৎকৃষ্ট কলের সাহায্যে সুলভে মাল তৈয়ারি করিয়া ভারতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এইপ্রকারে শিল্পজীবী ভারতবাসীগণ কৃষিজীবীতে অবনত হইয়াছে।[১২] (রমেশচন্দ্রের নিজস্ব অনুবাদ)

লর্ডস ও কমন্স কমিটির শিল্প ভাবনা এবং রমেশচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া

রমেশচন্দ্র আরো বলেন যে, ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে আরেকবার সনদ নবীকরণের সময় যখন এল, তখন প্রশ্ন উঠেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হবে কিনা। ইংল্যান্ডের জনমত ছিল এইরূপ যে, ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের সম্পর্কের দায়িত্ব কোম্পানির পরিবর্তে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হোক। লন্ডন তথা সমগ্র ইংল্যান্ডের বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি আশা করতেন যে, কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করতে পারলে

ভারতবর্ষে নিজেদের বাণিজ্য বাড়াতে পারবেন। সনদ নবীকরণের সময় তাঁরা এই যুক্তিটির উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে কোম্পানির বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হয়েছিল। তবে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ বাস্তবায়নের পথ সহজ ছিল না। বিগত তিন বছর (১৮৩০-৩২) এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলেছিল। ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে 'লর্ডস কমিটি' র সামনে মূল্যবান সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল। এর চেয়ের মূল্যবান ও বিশদ সাক্ষ্য ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে 'কমন্স কমিটি'র সামনে প্রদান করা হয়েছিল। এগুলি প্রায় ছ-হাজার পৃষ্ঠা-সংবলিত ছ-খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩]

রমেশচন্দ্র বলেন যে, এই সুবিশাল সাক্ষ্যের যে-সমস্ত অংশ বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত, সেগুলি কিছুটা একপেশে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের শিল্প এবং ভারতীয় কারিগরদের মজুরি ও মুনাফা প্রভৃতি বিষয় 'লর্ডস কমিটি' ও 'কমন্স কমিটি'কে খুব একটা কৌতূহলী করেনি। তাঁরা অনুসন্ধান করেছিলেন, কোম্পানির বাণিজ্যের বিলুপ্তি ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াবে কিনা, ইংল্যান্ডের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারকদের উপকার করবে কিনা। ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিজস্ব বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি বিধান ১৮১৩ বা ১৮৩২-এর তদন্তের লক্ষ্য ছিল না। বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্তও এই লক্ষ্য গুরুত্ব সহকারে ও নিয়মিতভাবে অনুসৃত হয়নি।

সুতরাং রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে 'লর্ডস কমিটি' ও 'কমন্স কমিটি' ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যে সব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ভারতবর্ষের জনসাধারণের কর্মসংস্থান করত – যেমন ইটখোলা ও গৃহ নির্মাণ, পাথর-কাটা, ছুতোরগিরি, নৌকা-বানানো, আসবাবপত্র, পিতল, লোহা ও তামার বাসনপত্র, সোনা ও রূপার কাজ, রঞ্জন, শোরা, কফি, চা, চিনি ও চামড়া পাকা করার শিল্প, কয়লা ও কাঠ শিল্প, তামাক শিল্প, এবং ভারতবর্ষের ক্ষীয়মান তুলা, রেশম, সুতা-কাটা ও তাঁত শিল্প –প্রভৃতি এই কমিটিদ্বয়কে তেমন আগ্রহ তৈরি করাতে পারেনি। ফলে ভারতবর্ষের এই শিল্পগুলি দিনের পর দিন অবহেলিত হয়েছিল। আসলে তাঁদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তৈরি পণ্য সামগ্রীকে যতদূর সম্ভব ব্রিটেনের প্রস্তুর পণ্য দিয়ে স্থানচ্যুত করা।[১৪]

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টারি তদন্তের তারিখের ৫ বছর পরে (১৮৩৮) লিখতে গিয়ে রবার্ট মন্টগোমারি মার্টিন কঠোরতম ভাষায় তৎকালীন বাণিজ্য ও শিল্প নীতির বর্ণনা ও নিন্দা করেছিলেন। মন্টগোমারির পাশাপাশি ড. ফ্রান্সিস বুকাননের দেওয়া নথিকে রমেশচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মন্টগোমারি মার্টিন তাঁর *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে ভারতবর্ষের শিল্প অর্থনীতির ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছিলেন। মন্টগোমারি মার্টিন এইগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ড. ফ্রান্সিস বুকাননের দেওয়া অর্থনৈতিক তদন্তের বিবরণীর কিয়দংশ তুলে ধরেছিলেন। বুকানন সাহেব লিখছেন,

> সরকারের কাছে এই সরকারি বিবরণী দাখিল করার পর আমাদের লোলুপতা ও স্বার্থপরতার ভুক্তভোগীদের কল্যাণের জন্য ইংল্যান্ডে অথবা ভারতবর্ষে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা হয়েছে? হয়নি! বরং ইংরেজের বাণিজ্যের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার শিকার দুঃখী মানুষগুলিকে (ভারতীয়দের) আরো দীনদরিদ্র করে তোলার সম্ভাব্য সবকিছুই আমরা করেছি। অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে ইংল্যান্ড হিন্দুদের বাধ্য করেছে নিছক নামমাত্র শুল্কে ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানের বাষ্পচালিত তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করতে। আর বঙ্গ ও বিহারের হস্তচালিত তাঁতের সুন্দর জমিনের টেঁকসই কাপড়ের ইংল্যান্ডে আমদানির উপর গুরুভার এবং প্রায় নিবারণমূলক শুল্ক চাপানো হয়েছিল।[১৫] (তরুণ সান্যাল কর্তৃক অনুবাদ)

THE

HISTORY, ANTIQUITIES, TOPOGRAPHY, AND STATISTICS

OF

EASTERN INDIA;

COMPRISING THE DISTRICTS OF

BEHAR, SHAHABAD, BHAGULPOOR, GORUCKPOOR, DINAJEPOOR, PURANIYA, RUNGPOOR, & ASSAM,

IN RELATION TO THEIR

GEOLOGY, MINERALOGY, BOTANY, AGRICULTURE, COMMERCE, MANUFACTURES, FINE ARTS, POPULATION, RELIGION, EDUCATION, STATISTICS, ETC.

SURVEYED UNDER THE ORDERS OF THE SUPREME GOVERNMENT,

AND

COLLATED FROM THE ORIGINAL DOCUMENTS AT THE E. I. HOUSE,

WITH THE PERMISSION OF THE HONOURABLE COURT OF DIRECTORS,

BY

MONTGOMERY MARTIN,

AUTHOR OF THE "*History of the British Colonies*," &c.

IN THREE VOLUMES.

VOL. I.

BEHAR (PATNA CITY) AND SHAHABAD.

LONDON:

WM. H. ALLEN AND Co. LEADENHALL-STREET.

MDCCCXXXVIII.

মন্টগোমারি মার্টিন-এর রচিত *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের প্রচ্ছদ

রমেশচন্দ্র বলেন যে, সাক্ষী হোল্ট ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে 'কমন্স কমিটি' প্রশ্ন করেছিল, 'ভারতবর্ষের যে অংশে বৃহত্তম সংখ্যক ব্রিটিশ অধিবাসী দেখা যায়, সেখানে দেশীয় লোকেদের মধ্যে কি ইংরেজের রুচি, ফ্যাশন ও আচার ব্যবহারের প্রতি অনুরক্তির ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৃদ্ধি ঘটেছে?' হোল্ট ম্যাকেঞ্জি সাহেব উত্তরে বলেছিলেন যে,

> কলকাতার কথা বিচার করে আমার মনে হয় দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজি বিলাসব্যসনে লিপ্ত হওয়ার একটা লক্ষণীয় প্রবণতা দেখা গেছে; তাঁদের সুসজ্জিত গৃহ আছে, অনেকেই ঘড়ি পরে, তাঁরা গাড়ি চড়তে ভালোবাসে এবং শোনা যায় মদ্যপানও করে থাকে।[১৬] (তরুণ সান্যাল কর্তৃক অনুবাদ)

রমেশচন্দ্র বলেন যে, হোল্ট ম্যাকেঞ্জি সাহেবের এইরূপ সাক্ষ্য শুনে 'কমন্স কমিটি'র সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই চিত্র বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সার্বিক নয়। ভারতবর্ষের বৃহত্তর দেশীয় মানুষের পক্ষে বিলেতি শিল্প দ্রব্য পরিধান করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য যাতে বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদিত হতে পারে এবং বৃহত্তম সংখ্যক মানুষ যাতে তা ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে ব্রিটিশ প্রশাসনকে দেখা যায়নি,— আর এজন্য রমেশচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন।

রেলপথে অর্থ ব্যয় ও ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয়

ভারতীয় শিল্প ব্যবস্থার একটি বিশেষ অংশ (যেমন তাঁত ও রেশম শিল্প) ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। অথচ সেই কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানে ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। উপরন্তু ভারতবর্ষে রেল ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। রমেশচন্দ্র *Fortnightly Review* পত্রিকায় '*Famines in India*' (আগস্ট, ১৮৯৭) শিরোনামে প্রবন্ধে বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের এমন কোনো স্থান বাদ রাখতে চাননি, যেখান থেকে দ্রব্য ও খাদ্য রেলপথের মাধ্যমে স্থানান্তর করা যাবে না।[১৭]

রমেশচন্দ্র ঔপনিবেশিক সরকারের রেলপথ ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, কৃষি-নির্ভর ভারতবর্ষে রেলপথের চেয়ে জলসেচের প্রয়োজন বেশি ছিল। রেলপথ শিল্প ও বাণিজ্যকে চাঙ্গা করে তোলে, শিল্পহীন ভারতবর্ষে রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে।[১৮] আসলে রমেশচন্দ্র চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের সমকালীন যে পরিস্থিতি তাতে কৃষির উন্নতি ঘটালে তা অনুঘটক হিসাবে শিল্পের উন্নতি ঘটাবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের Glasgow নামক স্থানে 'Philosophical Institution'-এ *The Economic Condition of India* শিরোনামে দেওয়া বক্তৃতায় রমেশচন্দ্র বলেন যে, প্রত্যাশিতভাবেই ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য প্রসারে সহায়তাকারী রেলপথকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারতের কৃষি ও শিল্পের উপকারে লাগতে পারত যে সেচ-ব্যবস্থা সেটি অগ্রাধিকার পায়নি। রমেশচন্দ্র বলেন যে, রেলপথ সম্প্রসারণে যেখানে সরকার ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ব্যয় করেছিলেন, সেখানে মাত্র ২০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ (১৮৩৭-১৮৯৭-এর মধ্যে) জলসেচে ব্যয় করা হয়েছিল। ফলে কৃষি নির্ভর শিল্প অর্থনীতির বিকাশের পথটাই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রমেশচন্দ্র আরো বলেছিলেন যে, এই কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির বিকাশের পথ বন্ধ হওয়ায় পরিণাম ছিল দুর্ভিক্ষ। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'ফেমিন কমিশন' এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করলেও বাস্তবে তাঁদের প্রস্তাব সরকার উপেক্ষা করেছিল।[১৯]

ইতিপূর্বে ২৪শে মে, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের 'Westminster Town Hall'-এ ডাকা এক সভায় *The Land Tax, Railways and Irrigation* শিরোনামে বক্তৃতায় রমেশচন্দ্র একই মন্তব্য করেছিলেন।[২০] রেলপথ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে বিলেতি দ্রব্যের বাণিজ্য প্রতিদিন ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছিল। ব্রিটেনের ব্যক্তিগত বণিকগণ তাঁদের দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ভারতবর্ষের ন্যায় উপনিবেশের প্রেরণ করেছিল। তাঁদের কাছে ভারতীয় উপমহাদেশ হয়ে উঠেছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। ফলে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমশ ধ্বংস সাধিত হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পের এই অবক্ষয়ের জন্য রমেশচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

সম্পদের বহির্গমন ও ভারতীয় শিল্প বিপন্ন

রমেশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পকে উৎসাহ, রক্ষা ও উন্নতির জন্য কখনো কমিশন আহ্বান করা হয়নি। রমেশচন্দ্র এপ্রসঙ্গে বলেন যে,

> পৃথিবীর যে দেশই হউক, যাঁহাদের শিল্পজাত সম্যক উন্নতিলাভ করে নাই, - তাঁহারা উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাদের শিল্প যাহাতে রক্ষা পায়, সে জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছে। অপর পক্ষে, ভারতের শিল্পকে কখনও উৎসাহিত করা হয় নাই বা তাহার রক্ষার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। বিলাতী মূলধনের লাভের দিকে অতি সাবধান মনোযোগ সর্বদাই দেখা যাইতেছে। অসংখ্য কমিশন বসিয়া তুলা, নীল কাফি, চা, চিনি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়াছে,- কি উপায়ে ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে। ভারতের শিল্পের উন্নতির কল্পে কখনও কমিশন আহূত হয় নাই।[২১]

রমেশচন্দ্র আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের ভোটদাতারা যাতে মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন তুলে না নেয় সে জন্য তাঁদের পছন্দ মত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ শুল্ক আইন পাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন – যা কোন প্রজাহিতৈষী সরকারের পক্ষে পাশ করানো সম্ভব নয়। এইরূপ এক সময়ে যখন ভারতবর্ষে শিল্প বিপন্ন, লোকে ক্রমশ কৃষি নির্ভর হতে বাধ্য হচ্ছে, সে সময়ে লন্ডনের 'ইন্ডিয়া অফিস'-এর খরচ, ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন, বিলেতি মহাজনদের সুদ যোগাবার জন্য রাশি রাশি ভারতীয় কাচামাল, সোনা-রূপা ইংল্যান্ডে পাঠাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবিষয়ে রমেশচন্দ্রের দেওয়া নিম্নের তালিকা প্রণিধানযোগ্য।

সারণি: ১. (খ). ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষেরর বার্ষিক গড়পড়তা আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ[২২]

বার্ষিক গড়পড়তা	ইংল্যান্ড থেকে আমদানি মাল ও সোনা-রূপা	ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি মাল ও সোনা-রূপা	আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি আধিক্য (ভারতবর্ষের আর্থিক শোষণ)
১৮৫৯-১৮৬৩	৪১ কোটি টাকা	৪৩ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা
১৮৬৪-১৮৬৮	৪৯ কোটি টাকা	৫৭ কোটি টাকা	৮ কোটি টাকা
১৮৬৯-১৮৭৩	৪১ কোটি টাকা	৫৭ কোটি টাকা	১৬ কোটি টাকা
১৮৭৪-১৮৭৮	৪৮ কোটি টাকা	৬৩ কোটি টাকা	১৫ কোটি টাকা
১৮৭৯-১৮৮৩	৬১ কোটি টাকা	৮০ কোটি টাকা	১৯ কোটি টাকা
১৮৮৪-১৮৮৮	৭৫ কোটি টাকা	৯০ কোটি টাকা	১৫ কোটি টাকা
১৮৮৯-১৮৯৩	৮৮ কোটি টাকা	১০৮ কোটি টাকা	২০ কোটি টাকা
১৮৯৪-১৮৯৮	৮৮ কোটি টাকা	১১৩ কোটি টাকা	২৫ কোটি টাকা

সুতরাং বিগত ৪০ বছরে (১৮৫৯-১৮৯৮) ভারতবর্ষে আর্থিক শোষণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২ কোটি থেকে ২৫ কোটি টাকা। এই টাকার অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীর উপার্জন বলে রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন। আর ভারতীয় শিল্পের এই অবনতির ও দারিদ্র্যের জন্য তিনি ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃক সম্পদের এই বহির্গমনকেই দায়ি করেছিলেন। রমেশচন্দ্রের এইরূপ মন্তব্যের মধ্যে তাঁর জাতীয়তাবাদী মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল।

রমেশচন্দ্র বলেছিলেন যে, ঔপনিবেশিক কালপর্বে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন উপায়ে সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'হোমচার্জ' বাবদ অর্থ বিলেতে প্রেরণ। রাণীর শাসককালে

যে ভাবে 'হোমচার্জ' বাবদ ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ ইংল্যান্ডে পৌঁছেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়ায় যায় রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'Indian Finance, Genesis of the Indian Debt' অধ্যায়ে।[২৩]

স্বদেশে শিল্প সম্মেলনে রমেশচন্দ্রের বক্তব্য

কেবল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার মধ্যে নয়, স্বদেশের একাধিক শিল্প সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের শিল্পের অধোগতি ও পতনের কারণকে তুলে ধরেছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীতে 'জাতীয় মহাসমিতি' দ্বারা আহূত প্রথম শিল্প সমিতিতে রমেশচন্দ্রকে সভাপতি পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। সম্মেলনে তিনি সভাপতির ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তার এই ভাষণ পরবর্তীতে ১৩১২ বঙ্গাব্দে *ভান্ডার* পত্রিকায় 'বারাণসী শিল্প-সমিতি' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই শিল্প সম্মেলন দেওয়া বক্তৃতায় রমেশচন্দ্র ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিল্পের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছিলেন। সভাপতির ভাষণে রমেশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন, কি ভাবে ফ্রান্স, জার্মানী, ইউনাইটেড স্টেট এবং ইংল্যান্ডের অন্যান্য উপনিবেশগুলির কুটিরশিল্প ও হস্ত-শিল্প ক্রমশ উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছিল, আর ভারতবর্ষের সাধারণ তাঁতিরা ক্রমশ হত দরিদ্র হয়ে পড়েছিল।[২৪]

রমেশচন্দ্র ২৮শে মার্চ, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেছিলেন, যেখানে তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্প অর্থনীতির বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন।[২৫]

বিদেশে একাধিক প্রতিষ্ঠানে রমেশচন্দ্রের শিল্প-অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বক্তব্য

স্বদেশের পাশাপাশি বিলেতের একাধিক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত বক্তব্য প্রদান করার জন্য রমেশচন্দ্রকে বিশেষ অতিথি রূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের একাধিক সমস্যা ও ঔপনিবেশিক প্রশাসকের প্রশাসনের আসল সরূপ উত্থাপন করার এটি ছিল রমেশচন্দ্রের কাছে পূর্ণ সুযোগ। বিলেতে এইরূপ একাধিক বক্তৃতায় তিনি ভারতবর্ষের শিল্প-অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পত্রিকা *Contemporary Review*-তে দাদাভাই বলেছিলেন যে, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষকে যদি স্বাভাবিক অর্থনীতির শর্ত পালন করে অবাধে বিকাশ লাভ করতে দেওয়া হত, তাহলে শিল্পের উন্নতি হত।[২৬] ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের Glasgow নামক স্থানে 'Philosophical Institution'-এ *The Economic Condition of India* শিরোনামে রমেশচন্দ্রের দেওয়া বক্তৃতায় একই সুর শোনা গিয়েছিল। রমেশচন্দ্র বলেছিলেন,

> আপনাদের এবং আমাদিগের স্বার্থ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, বিপরীত নহে। যদি আমাদিগের শিল্প কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করা হইত এবং ভারতবর্ষের শিল্প-সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে ত্রিশ হাজার মিলিয়ন ভারতবাসী আপনাদের শিল্পজাত পণ্যের ক্রেতা হইতে পারিত। কিন্তু যদি তাহারা দরিদ্র, সম্পদহীন, কৃষিহীন হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে আপনাদের দ্রব্য প্রেরণ ও বৃদ্ধি ঘটানো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পরিগণিত হইবে। ব্রিটিশদের দ্রব্যের বাজার হিসাবে ভারতবর্ষ উপযুক্ত হইতে পারে যদি ব্রিটিশ শাসনের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় জনগণের উন্নতি সাধিত হয়।[২৭]

এছাড়াও ২০শে ডিসেম্বর, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে Sukha Samiti-তে *Indian Manufacture* শিরোনামে বক্তৃতায় বিগত ১৫০ বছরের শিল্প অবনতির দুঃখজনক অধ্যায় রমেশচন্দ্র আলোচনা করেছিলেন। আসলে তিনি বিলেতে জনগণের মধ্যে ভারতবর্ষের শিল্প-অর্থনীতির দুরবস্থা সম্পর্কে অবগত করতে চেয়েছিলেন। যে ব্রিটিশ শক্তি গণতন্ত্রের কথা বলেন, তাঁরাই আবার ভারতবর্ষের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য অর্থনীতির উপর আঘাত হেনেছিলেন।

সুতরাং, ইংরেজি ও বাংলায় রচিত একাধিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে এবং স্বদেশ ও বিদেশে একাধিক স্থানে বক্তৃতায়

রমেশচন্দ্র ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ও তার পতনের জন্য ব্রিটিশ প্রশাসনের সংকীর্ণ স্বার্থনীতিকে যেভাবে সমালোচনা করেছিলেন, তার মধ্যে একপ্রকার জাতীয়তবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রমেশচন্দ্র কখনই সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাননি। একজন নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়া ছিল আদর্শ বিরোধী। সর্বোপরি, সিভিল সার্ভিসে থাকাকালীন ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত এলাকায় তাঁকে বিচরণ করতে হয়েছিল। ছুটিতে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। বঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্পের প্রকৃত অবস্থা তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষের যে শিল্প দ্রব্য একদা ইউরোপ তথা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের চাহিদা পূরণ করত, তার এই অবনতি ও অবক্ষয়ের জন্য ব্রিটিশ প্রশাসনের গণতন্ত্র বিরোধী নীতি ও আইন মূল দায়ি। তাই তিনি পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটিগুলি তুলে ধরবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এজন্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা এবং স্বদেশে ও বিদেশে একাধিক প্রতিষ্ঠান ও সম্মেলনে তিনি ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতি সমালোচনা করেছিলেন। তবে উল্লেখ্য তিনি কখনই ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাননি। ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে থেকেই তিনি ভারতবর্ষের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সূত্র নির্দেশ:

১. দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৩৭৯), *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ১৭৫৭-১৮৩৭* (*The Economic History of India. Vol. I: Under Early British Rule 1757-1837* গ্রন্থের অনুবাদ; অনুবাদক তরুণ সান্যাল সম্পাদিত), সারস্বত লাইব্রেরী, পৃ. 'সম্পাদকের ভূমিকা' ৩৪, ৪৪।

২. Dutt, Romesh Chandra, (1985). *England and India: A Record of Progress during a Hundred Years 1785-1885*, Mudgal Publication, p. 128.

৩. Chandra, Bipan, (1991). *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India: Economic Policies of Indian National Leadership 1880-1905*, People Publishing House, p. 57.

৪. দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৯৭৫), 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি', *রমেশ-রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), ড. আশুতোষ দাস (সম্পাদক), ইউনাইটেড পাবলিশার্স, পৃ. ৭ (পরার্ধ)।

৫. *তদেব।*

৬. Dutt, Romesh Chandra, (1985). *op.cit.,* p. 127.

৭. দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৯৭৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৮ (পরার্ধ)।

৮. *তদেব,* পৃ. ৮ (পরার্ধ)।

৯. *তদেব।*

১০. *তদেব,* পৃ. ৯ (পরার্ধ)।

১১. *তদেব,* পৃ. ১০ (পরার্ধ)।

১২. *তদেব।*

১৩. এই ছয়টি খণ্ড ছিল - ১) Public, ২) Finance and Trade, ৩) Revenue, ৪) Judicial, ৫) Military, ৬) Political দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৩৭৯), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৮২।

১৪. *তদেব*, পৃ. ২৯৮।

১৫. Martin, Montgomery, (1838). *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, Vol, III, London: W. H Allen and Co., Leadenhall Street, p. Introduction; দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৩৭৯), *তদেব*, পৃ. ৩০০।

১৬. *তদেব*, পৃ. ৩০০।

১৭. Dutt, Romesh Chandra, (1986). 'Famines in India', *Open Letters to Lord Curzon: Speeches and Papers on Indian Question (1897-1900),* Gyan Publishing House, p. 7.

১৮. Chandra, Bipan, (1991). *op.cit.,* p. 180.

১৯. Dutt, Romesh Chandra, (1986). *op.cit.,* p. 8.

২০. Dutt, Romesh Chandra, (1986), 'The Land Tax, Railways and Irrigation', *Open Letters to Lord Curzon: Speeches and Papers on Indian Question (1901-1902), op.cit.,* pp. 27-33, 76-78.

২১. দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৯৭৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২ (পরার্ধ)।

২২. *তদেব*, পৃ. ১৩ (পরার্ধ)।

২৩. Dutt, Romesh Chandra, (2006). *The Economic History of India : In the Victorian Age 1837-1900, Vol. II,* Director, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, p. 147.

২৪. দত্ত, রমেশচন্দ্র, (১৯৭৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৬-৮৮।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ, (শ্রাবণ, ১৩৫৪), *রমেশচন্দ্র দত্ত,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, পৃ. ৩১।

২৬. Chandra, Bipan, (1991). *op.cit.,* p. 164.

২৭. Dutt, Romesh Chandra, (1986). *op.cit.,* p. 82.